প্রথম অধ্যায়

নিম্নবর্গ : সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বিশ্লেষণ

১

‘নিম্নবর্গচর্চা’ বর্তমানে বহু আলোচিত একটি বিষয়। ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের পরিসর ছাড়িয়ে সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রেও নিম্নবর্গচর্চা, বৃহৎ পরিসর দখল করেছে। ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান আলোচনার সূত্রেই ‘নিম্নবর্গ’ (Subaltern) এখন একটি তত্ত্বে পরিণত হয়েছে। সমাজতত্ত্বের আলোচনায় ‘নিম্নবর্গ’ ধারণাটি এসেছে মার্কসচর্চার সূত্র ধরেই। যখন ফ্যাসিস্ট মুসোলিনি জেলে বন্দি ছিলেন তখন ইতালির কমিউনিস্ট নেতা আন্তেনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত ‘কারাগারের নোট বই’ (A prisoner’s Note Books ১৯২৯ থেকে ১৯৩৫ সালে রচিত) গ্রন্থে মার্কস-এর ভাবনাকেই মুসোলিনির প্রহরা এড়িয়ে ‘প্রলেতারিয়েত’ শ্রেণি অর্থে ‘সাবলটার্ন’ শব্দটি সুকৌশলে প্রয়োগ করেছিলেন। ব্যাপকার্থে এই প্রতিশব্দটি ইতালির পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মেহনতি শ্রমিক শ্রেণিকেই নির্দেশ করে। তবে নিম্নবর্গ ইংরেজি ‘সাবলটার্ন’ (Subaltern) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। সামরিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সাবলটার্ন শব্দটি ব্যবহার করা হত, ক্যাপ্টেনের অধঃস্তন কর্মচারী অর্থাৎ বড়ো অফিসারের অধীনে যে ছোট অফিসার থাকেন তাকে বলা হত সাবলটার্ন। এর ব্যবহার অনেকটা অনুন্নত বা সাবর্ডিনেট অর্থে। অর্থাৎ সাবলটার্ন মানে হল অধস্তন, নীচে যার অবস্থান। আবার অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্রে ‘সাবলটার্ন’-এর অর্থ ‘এমন একটি প্রতিজ্ঞা যা অন্য কোনও প্রতিজ্ঞার অধীন যা বিশিষ্ট, মূর্ত, সার্বিক নয়।’

গ্রামসি ‘কারাগারের নোটবই’ গ্রন্থে ফ্যাসিস্ট শক্তির শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে রূপক ভাষার সাহায্যে মার্কসবাদের বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রূপক ভাষায় গ্রামসি মার্কসবাদ আলোচনা করতে গিয়ে প্রচলিত মার্কসবাদী পরিভাষার উপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে নিলেন। এই প্রক্রিয়ায় পরিচিত মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যায় গ্রামসির নিজস্ব অভিমত, তাৎপর্য ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটিয়েছে। মার্কসীয় আলোচনায় প্রাথমিক দুটি পারিভাষিক শব্দ—পুঁজিমালিক বা বুর্জোয়া এবং শ্রমিক শ্রেণি বা ‘প্রলেতারিয়েত’ গ্রামসির ভাষায় এই দুটি শব্দের প্রতিশব্দ যথাক্রমে ‘হেজেমনিক’ আর ‘সাবলটার্ন’। ‘মার্কসীয় দর্শন’এর বদলে তিনি ব্যবহার করেন ‘প্রেক্সিসের দর্শন’। ইতালীয় ‘সুবলতের্নো’ শব্দটিকেই গ্রামসি প্রলেতারিয়েত শব্দের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করেন। মূলত সুবলতের্নো বলতে তিনি শ্রমিক শ্রেণিকেই বুঝিয়েছেন। অর্থনীতি নির্ভর পুঁজিবাদী সমাজে মালিক শ্রেণিই ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করে, শ্রমিকশ্রেণি সেখানে সাবলটার্ন। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইতালির অসম্পূর্ণ পুঁজিবাদী বিকাশ পর্বে প্রভুত্বের

অধিকারী সামন্ত শ্রেণি এবং প্রভুত্বের অধীনস্থ কৃষক শ্রেণিই গ্রামসির লেখায় অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

> ‘‘ইউরোপীয় মার্কসবাদের আদিপর্বে কৃষকের সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা, আচার আচরণ ও রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে যে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞার ভাব ছিল তার বিরুদ্ধে গ্রামশি বলে গেছেন ‘সাবলটার্ন’ কৃষকদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার বিশিষ্ট লক্ষণগুলির কথা এবং বিপ্লবী নেতৃত্ব তথা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই লক্ষণগুলিকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করা ও বোঝার প্রয়োজনের কথা। অথচ একই সঙ্গে তিনি ক্রমাগত জোর দিয়েছেন কৃষকশ্রেণীর চেতনার সীমাবদ্ধতার উপর ... গ্রামশি কৃষক-চেতনার সীমাবদ্ধতা এবং পরনির্ভরতার কথা বলেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথা বলেছেন যে, যে কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব / অধীনতা সম্পর্কটা হল বিরোধিতার সম্পর্ক।” [১]

তিনি দেখিয়েছেন প্রভুত্ব আর অধীনতার সম্পর্ক, শাসক শোষক আর শাসিত ও শোষিতের সম্পর্ক চিরকালই বিরোধের। গ্রামসির মতে ‘সাবলটার্ন’ শ্রেণির বিপরীতে অবস্থিত ‘হেজিমনিক’ শ্রেণির কর্তৃত্বেই শোষিত ও শাসিত হয় ‘সাবলটার্ন’ শ্রেণি। কেবল শাসন-যন্ত্রে প্রভুত্ব স্থাপন নয় সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের ক্ষেত্রেও সে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে। আবার সামাজিক ক্ষমতা বিন্যাসের ধারায় যে শ্রেণি প্রভুত্ব স্থাপন করে অর্থাৎ ডমিন্যান্ট হয়ে যায় তারও বিপরীতে অবস্থান করে ‘সাবলটার্ন’ শ্রেণি। গ্রামসি দেখালেন পরনির্ভরতা সত্ত্বেও সাবলটার্ন শ্রেণি সময়ে সময়ে প্রতিবাদে, প্রতিরোধে গর্জে ওঠে আর তখনই প্রভুত্বকারী শক্তির বিপদ ঘনিয়ে আসে।

> ‘‘সংস্কৃতি বা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে লোকসংস্কৃতি যদিও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের চাপে ভারাক্রান্ত থাকে তা সত্ত্বেও সাবলটার্ন শ্রেণীগুলি তাদের নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সেই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদানকেই মাত্র বেছে নেয়, সবটুকু নেয় না। ফলে ধর্মীয় জীবনের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারার মধ্যেও এক ধরনের স্তরবিন্যাস দেখা দেয়। শাসকশ্রেণীর ধর্মবিশ্বাস আর তাদের অধীন শ্রেণীগুলির ধর্মবিশ্বাস প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এক হলেও তাদের আকার ও চরিত্র পৃথক, এমন কী বিরোধী রূপও ধারণ করতে পারে। এই বিরুদ্ধতা থেকেই জন্ম নেয় সাবলটার্ন শ্রেণীর প্রতিরোধ, যা বহু সময়ই ক্ষমতাশীল শ্রেণীগুলিকে বিপদে ফেলতে সক্ষম হয়।”[২]

এভাবেই গ্রামসি ব্যাখ্যা করলেন প্রভুশক্তির চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা, সক্রিয়তা আর শ্রেণিবিভক্ত সমাজে খণ্ডিত, নির্জীব ও পরাধীন কৃষক-চেতনার কথা। বিদ্রোহে বিক্ষোভে সামিল হলেও কৃষক-চেতনা আচ্ছন্ন থাকে শাসক শ্রেণির মতাদর্শের আবরণে। এ কারণেই তাদের ন্যায়সংগত বিদ্রোহ পরাজিত হয়। তবে গ্রামসি দেখালেন পরনির্ভরতার অজস্র অনুসঙ্গ থাকা

সত্ত্বেও কৃষকচেতনা স্পষ্টতই সামন্ত চেতনার বিপরীত মেরু। সে-চেতনা সীমাবদ্ধ। 'সাবলটার্ন' চেতনার সীমাবদ্ধতার কথাই যদিও গ্রামসির লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে, তা সত্ত্বেও 'এই চেতনার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিতও তাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আছে।' এভাবেই গ্রামসির বিশ্লেষণ থেকে উঠে আসে 'সাবলটার্ন' চেতনার এক সম্ভাবনাময় দিক। বলা যায় গ্রামসিকে অনুসরণ করেই নিম্নবর্গ ধারণাটির উদ্ভব ঘটে।

২

বিশ শতকের শেষদিকে এদেশে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাবলটার্ন সম্পর্কিত চর্চা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গেই রণজিৎ গুহ প্রথম 'সাবলটার্ন'-এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'নিম্নবর্গ'-এর উল্লেখ করলেন। ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বিগত দুই দশকে নিম্নবর্গের ইতিহাস চিন্তাচর্চার একটি স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল ধারা প্রচলিত হয়ে গেল। আর ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম সাবলটার্ন স্টাডিজ সম্মেলন ও আট খণ্ডে সংকলিত 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশের ঘটনা এই ইতিহাস চর্চার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহপথটি চিহ্নিত করে, আমাদের প্রথাগত ইতিহাস থেকে সমাজের অনেক কথায় যা জানা যায় না। আধিপত্যহীন সাধারণ মানুষ নয়, সেই ইতিহাসে মুখ্য ছিল রাজারাজড়াদের কাহিনী অর্থাৎ রাজকাহিনী। বিশ শতকের শেষদিকে ইতিহাসের এই অসম্পূর্ণতা স্পষ্ট হতে শুরু করে, নিউ হিস্টিরিসিস্টরা বিগত দিনের এই ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করতে চাইলেন। ১৯৭০-র দশকে ভারতের মার্কসবাদী রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ ঘটে যায় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'-এর শিকড় খুঁজে পাওয়া যায় সেই অসম্পূর্ণ বিতর্কে।

ইতিহাস একটি চলমান বিষয়, তার কোনও স্থির বিন্দু নেই, তা নৈর্ব্যক্তিক, নিরপেক্ষও নয়। বিশ শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত ইতিহাসচর্চার বেশ কয়েকটি ধারা লক্ষিত হয়। যেমন—

১। পৌরাণিক ইতিহাস চর্চার ধারা

২। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা

৩। কেমব্রিজ-অক্সফোর্ড ইতিহাস চর্চার ধারা

৪। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা

৫। মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা

৬। সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার ধারা

৭। পোস্টমডার্ন ইতিহাস চর্চার ধারা [৩]

→ পৌরাণিক ইতিহাস চর্চার মধ্যে বেশির ভাগটাই রাজকাহিনী আরবি-ফারসি ইতিহাস চর্চা এর মধ্যেই পড়ে। এখানে সাধারণ্যের কোনও অস্তিত্ব নেই।

→ এরপর ইতিহাসে প্রধান হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা, তারাই ইতিহাসের নায়ক হয়ে উঠল, জনগণ এখানেও উপেক্ষিত।

→ বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী প্রভুশক্তির প্রাধান্য দেখা গেল কেমব্রিজ-অক্সফোর্ড ইতিহাস চর্চায়।

→ জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চাতেও প্রাধান্য পেল উচ্চবর্গের মানুষ। মুখ্য হয়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি প্রভুশক্তি, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা উচ্চবর্গের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। উচ্চবর্গই এখানে নায়ক। নিম্নবর্গের বিদ্রোহ আন্দোলনগুলিকে তারা অস্বীকার করলেন, ইতিহাসে তাদের স্বীকৃতি দিলেন না। এই সময়ে ভারতবর্ষও পশ্চিমিতত্ত্বের আলোয় নিজেদের ইতিহাস বিচার বিশ্লেষণ করল। এই ধারায় রচিত হল জাতীয়তাবোধের ইতিহাস।

→ এরপর এল মার্কর্সবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা। এই ইতিহাস চর্চায় উঠে এল শ্রেণির প্রসঙ্গ। মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে কয়েকটি নতুন সম্ভাবনার দিক উঠে এল, সেই সঙ্গে দেখা দিল কিছু নতুন সমস্যাও। এখানে শ্রেণির প্রসঙ্গ এলেও আলাদা করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আইডেনটিটি খুঁজে পাওয়া গেল না। আবার নারী সমাজ, প্রান্তিক কৃষক, দলিত নিম্নবর্গের মানুষও থাকল উপেক্ষিত। ভারতবর্ষে রজনীপাম দত্ত, ডি. ডি. কোশাম্বীর মতো ঐতিহাসিকরা মার্কর্সবাদী ইতিহাস চর্চার ধারা নিয়ে এলেন। আর ইরফান হাবিব, ই. এইচ. কার, রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার প্রমুখ মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চার ধারাকে সমৃদ্ধ করলেন।

ইতিহাস চর্চার এইসব তত্ত্ব দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্বকে প্রভাবিত করল। এর পরবর্তী পর্বের ঘটনা ও তার প্রভাব বদলে ফেলল ইতিহাস চর্চার বিষয়কেও।

> ‘‘শিল্প বিপ্লব দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ, বিশ শতকের তিনের দশকের অর্থনৈতিক মন্দা, ঠাণ্ডা যুদ্ধ, মহাকাশ যুগ, দেঁতাত, আরব ভূখণ্ডে তেল সংকট, ঔপনিবেশিক প্রভুদের হাত থেকে এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মুক্তি, ভিয়েতনামের যুদ্ধ, ফ্রান্সে ৬৮-র ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাসের তত্ত্বগুলির ওপর প্রভাব ফেলতে থাকে, ইতিহাস-তত্ত্বগুলির কাঠামোয় ভাঙচুর চালাতে থাকে।’’ [৪]

→ এরপর কিছু তরুণ ঐতিহাসিকরা মনে করলেন যে, মার্কসবাদী ইতিহাস চর্চার মধ্যেও আছে বুর্জোয়া যুক্তিবাদ। ১৯৮২ সালে এই তরুণ ঐতিহাসিকের দলই প্রকাশ করলেন 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'এর প্রথম খণ্ড। এই সকল ঐতিহাসিকেরা নিম্নবর্গের মানুষের চোখে ইতিহাসকে দেখার এক সমান্তরাল পাঠ রচনা করলেন নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে। এই বিরোধী নিওহিস্টরিসিস্টরা হলেন—রণজিৎ গুহ, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে, ডেভিড হার্ডিমান, শাহিদ আমিন, ডেভিড আর্নলড, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপেশ চক্রবর্তী, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, গৌতম ভদ্র প্রমুখ। ইতিহাসের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাওয়া নিম্নবর্গের মানুষের বিদ্রোহ আন্দোলন গুলির মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষের কণ্ঠস্বরকে ইতিহাসে তুলে আনার চেষ্টা করলেন এই 'সাবলটার্ন' ঐতিহাসিকরা। এতদিনের প্রথাগত ইতিহাস রচনার অসম্পূর্ণ অংশটা এই ঐতিহাসিকদের পুনর্নির্মিতিতে সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। নিম্নবর্গের মানুষ প্রাধান্য পেতে থাকে প্রথাগত ইতিহাস বহির্ভূত রচনায়।

→ ইতালির সাম্যবাদী আন্দোলনের দার্শনিক আন্তোনিও গ্রামসির দর্শন থেকেই সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত। আর এই সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার পথ ধরেই মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা, লিওতার, জাক লাকাঁ, রোঁলাবার্ত্ত, য়ুর্গেন হাবেরমাস, ফ্রেডরিক জেমিসন, ক্রিস্টোফার নরিস, লুই আলথুসের প্রমুখ পোস্টমডার্ন ইতিহাস চর্চার পথকে প্রশস্ত করেছেন। পোস্টমডার্ন সমাজতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদরা বললেন কলোনিয়াল ডিসকোর্স কখনও নিম্নবর্গের স্বরগ্রামকে বোঝেনি বা তাদের 'space' ছেড়ে দেয়নি। তাই এই তত্ত্বের ভাঙন আর নতুন চেতনার উদ্ভবের প্রয়োজন কারণ পোস্টমডার্ন চেতনা চায় আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। সর্বোপরি পোস্টমডার্নরা ইতিহাসের কোন মহা আখ্যানে বিশ্বাস করেন না।

৩

এখন সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার তার্কিক আলোচনা, রচিত হচ্ছে সাবলটার্ন ডিসকোর্স। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার মতো উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও আজ 'সাবলটার্ন স্টাডিজ' চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষেও সমাজ ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতকে নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেছেন সাবলটার্ন স্টাডিজ-এর প্রবক্তারা। ভারতীয় 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'এর ঐতিহাসিকেরা ভারতের কলোনির ইতিহাসকে সমাজ পিরামিডের নীচু তলা থেকে দেখতে চেষ্টা করলেন। উঠে এল ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতার বিন্যাস, উৎপাদন ব্যবস্থা সংস্কৃতি ও সমাজচেতনা। এভাবেই—

“ ‘সাবলটার্ন’ বা ‘নিম্নবর্গ’ শব্দের বহুল ব্যঞ্জনার চক্রে ঘুরতে থাকে বিভিন্ন স্তরের সামাজিক ইতিহাস।” [৫]

নিম্নবর্গের ইতিহাসবিদরা উচ্চবর্গের পক্ষপাতী ইতিহাস নির্মাণের ঔপনিবেশিক আদিকল্পকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের এতকালের মৌরসিপাট্টা ভাঙতে চাইলেন। তারা ঘোষণা করলেন যে, ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে তাঁরা আর ‘রাজকাহিনী’ লিখবেন না, নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র প্রভুত্ব-বিরোধী রাজনীতির সন্ধান করবেন। তৈরি করবেন বিকল্প মতাদর্শ (counter ideology)। ইতিহাসবিদরা গুরুত্ব দিলেন নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র চেতনার উপর, তৈরি করতে চাইলেন প্রতিস্পর্ধী বিকল্প ইতিহাস। এক্ষেত্রে গ্রামসির আধিপত্যবাদের ধারণা তাদের প্রাণিত করে। প্রথম পর্বে এরা অন্ত্যজ আদিবাসীদের সংগ্রাম এবং অসম্পূর্ণ কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস গুলিকে গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেন। কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস অনুসন্ধান করে বিদ্রোহী কৃষকচৈতন্যের প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন। তাঁদের এই চেষ্টার মাধ্যমে ইতিহাস চর্চায় কিছু নতুন সূত্র আবিষ্কৃত হল। কিন্তু সে-সূত্রই সবটা নয়,—

“... শাসকবর্গের প্রতিনিধিরা যেখানে কৃষক বিদ্রোহের রিপোর্ট দিচ্ছে রাষ্ট্রশক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই সরকারি রিপোর্টের বর্ণনাকেই বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উল্টো করে পড়লে বিদ্রোহী কৃষক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়— নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা, এর অনেক উদাহরণ এনে হাজির করলেন ... সেসবের যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা খাড়া করে একরাশ মিথ্যার ভেতর থেকে সঠিক ইতিহাসটুকু বের করে আনার চেষ্টা করেন, তখন তাঁরা কৃষকচেতনার বিশিষ্ট উপাদানগুলিকেই আসলে হারিয়ে ফেলেন। হয়তো নিজেদের অগোচরেই তারা নিম্নবর্গের রাজনীতিকে উচ্চবর্গের চেতনার ছকে ফেলে বোধগম্য করার চেষ্টা করেন। নিম্নবর্গের নিজস্ব ইতিহাস, অথবা অন্যভাবে বললে, ইতিহাসে নিম্নবর্গের কীর্তির স্বাক্ষর কিন্তু সেখানে হারিয়ে যায়।”[৬]

দেখা গেল সাবলটার্ন স্টাডিজ ভারতবর্ষের ইতিহাসের লেখক-পাঠকদের সামনে দুটি বিষয়কে উপস্থাপিত করল

ক। ঔপনিবেশিক ভারতে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের স্বাতন্ত্র্য,
খ। কষক-চৈতন্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

নিম্নবর্গীয় ভাবনাটি গড়েই ওঠে এই দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। সাবলটার্ন স্টাডিজ প্রথম খণ্ডের গোড়ায় রণজিৎ গুহ রচিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যাকে পরবর্তীকালে অনেকে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার ম্যানিফেস্টো বলে অভিহিত করেছেন। এই প্রবন্ধের প্রথম

লাইনেই বলা হয়, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাস রচনায় দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক উচ্চবর্গ আর বুর্জোয়া-জাতীয়বাদী উচ্চবর্গের আধিপত্য চলে আসছে। নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার উদ্দেশ্য হল এই দুই ধরনের উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিরোধিতা করা'। এ প্রবন্ধের আলোচনায় রণজিৎ গুহ উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অবস্থান আর প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুটি সূত্রের উল্লেখ করেছেন—

(i) ঔপনিবেশিক ভারতে রাজনীতির ধারা— উচ্চবর্গের রাজনীতির ধারা ও নিম্নবর্গের রাজনীতির ধারা। স্বতন্ত্র হলেও এই ধারা দুটি পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়। তারা বৈপরীত্যে বাধা এবং বেণীবন্ধের মতো কখনও কখনও তারা ঐতিহাসিক প্রতিচ্ছেদে যুক্ত হয়, কখনও আবার নিজ নিজ খাতে বয়ে চলে।

(ii) নিম্নবর্গের ইতিহাস শুধু ঘটনার পারম্পর্য আশ্রয় করে বোঝা বা লেখা যাবে না। ঘটনা বা সাধারণভাবে বস্তুর পরিস্থিতির মধ্যে উচ্চবর্গের সঙ্গে নিম্নবর্গের সম্পর্ক পরিষ্কার করে বিশ্লেষণ করতে হবে। এই সম্পর্ক আসলে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক, বৈপরীত্যের দ্ব্যণুক সম্পর্ক। [৭]

ঔপনিবেশিক ভারতে 'ক্ষমতা' এই একটি শব্দের মাপকাঠিতে আমাদের সমাজে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের বিভাজন হত। এই ক্ষমতা হতে পারে আর্থিক, হতে পারে প্রভুত্বের, কিংবা শোষণের। সামাজিক ক্ষমতাকে করায়ত্ত করে রাখা আর করায়ত্ত করতে না পারার লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ, এই মানদণ্ডের বিভাজনে বিভাজিত উচ্চবর্গ আর নিম্নবর্গ। ইতিহাসের ধারায় সেই শুরু থেকেই উচ্চবর্গের ক্রিয়াকলাপকেই বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিম্নবর্গ এসেছে তবে তার প্রকৃত অবস্থানকে উপস্থাপিত করতে নয়, যতটুকু প্রয়োজন পড়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে আর তার বিদ্রোহী রূপের প্রকাশ-কালে। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রভুশক্তির অধিকারী ছিল যারা তারাই 'উচ্চবর্গ'। সেই উচ্চবর্গ অর্থাৎ প্রভুশ্রেণি দুভাগে বিভক্ত। বিদেশি ও দেশি। বিদেশি প্রভু দুধরনের সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি প্রভুশক্তির মধ্যে পড়ে অভারতীয় কর্মচারী ভৃত্যসকল; আর বেসরকারি প্রভুশক্তি হল খনির মালিক, জমিদার, নীলকুঠি ও চা বাগানের মালিক সম্প্রদায়, খ্রিস্টান মিশনারি, যাজক, পরিব্রাজক। ক্ষমতার পার্থক্য অনুযায়ী দেশি প্রভুশক্তিরও দুটি ভাগ। একটা সর্বভারতীয় একটা আঞ্চলিক। সর্বভারতীয় প্রভুশক্তি হল সামন্ত প্রভুরা, বাণিজ্য শিল্পে শক্তিমান বুর্জোয়া শিল্পপতি আর শাসনতন্ত্রে যুক্ত উচ্চপদের অধিকারী আমলা। দেশি প্রভুগোষ্ঠীও দুই শ্রেণির। এক শ্রেণি যারা সর্বভারতীয় প্রভুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যারা বিশেষ অবস্থায় আঞ্চলিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা নেয়, আর এক শ্রেণি যারা সম্পূর্ণরূপেই আঞ্চলিক বা স্থানিক। এদের নিজস্ব কোনও সামাজিক সত্তা নেই, প্রভুগোষ্ঠীর স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কাজ করে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এই বিভাজন মেনে যারা উচ্চবর্গভুক্ত তাদের বাদ দিলে যারা পড়ে

থাকে তারাই ‘নিম্নবর্গ’। সর্বোচ্চপদের আমলা বাদে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, শহরের শ্রমিক, গ্রামের গরিব চাষী মজুর এরাও ‘নিম্নবর্গের’ মধ্যেই গণ্য হয়।

elite : 1. Dominant foreign groups.

2. Dominant indigenous groups on the all-India level.

3. Dominant indigenous groups at the regional and local levels.

4. The terms ‘people’ and ‘subaltern classes’ [are] used as synonymous throughout [Guha’s definition]

The social groups and elements included in this category represent the demographic differences between the total Indian population and all those whom we have described as the ‘elite’

> “Taken as a whole and in the abstract this ... Category ... was heterogeneous in its composition and thanks to the uneven character of regional economic and social developments, different from area to area. The same class or element which was dominant in one area ... could be among the dominated in another. This could and did create many ambiguities and contradictions in attitudes and alliances, especially among the lowest strata of the rural gentry, impoverished landlords, rich peasants and upper middle class peasants all of whom belonged, ideally speaking to the category of people or subaltern classes.” (Guha 1982 : 8) [৮]

তাহলে আমরা দেখলাম এই উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের সম্পর্ক মূলত প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক। গ্রামসির পথ অনুসরণ করে নিম্নবর্গের ধারণাটির উদ্ভব ঘটলেও ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ও বিস্তারের ফলে মার্কসীয় তত্ত্ব বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে যেমন কয়েকটি নতুন ভাবনা দেখা দিয়েছে সেরকমই কিছু নতুন সম্ভাবনাও তৈরি করেছে। গ্রামসি দেখিয়েছেন প্রভুশ্রেণির চেতনার সমগ্রতা, মৌলিকতা ও সক্রিয় ইতিহাসবোধ এর পাশাপাশি নিম্নবর্গীয় কৃষকচেতনা এখানে খণ্ডিত, নির্জীব ও পরাধীন।

> “Gramsci claimed that the history of the subaltern classes just as complete as the history of the later is usually that which is accepted as ‘official’ history. For him, the history of subaltern social groups is necessarily fragmented and episodic since they are always subject to the activity of ruling groups, even when they rebel clearly

> they have less access to the means by which they may control their own representation, and less access to cultural and social institutions" [৯]

এখান থেকেই কৃষকের সংস্কৃতি, প্রতিদিনের জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার আচরণ, কৃষক শ্রেণির রাজনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে উচ্চবর্গের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সাবলটার্ন ইতিহাস চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের রাজনীতির পাশাপাশি নিম্নবর্গের রাজনীতির অস্তিত্বও ছিল একেবারে স্পষ্ট। নিম্নবর্গের অনুপ্রবেশ রাজনীতির একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র, উচ্চবর্গের প্রতিবাদ ছিল আইনের মধ্যে থেকেই অর্থাৎ আইনকে আশ্রয় করেই। নিম্নবর্গের প্রতিরোধ আইনের পথে হাঁটত না। আইনভঙ্গ করে তা হিংসাত্মক হয়ে উঠত। তাই তাদের প্রতিবাদ ছিল অপ্রত্যাশিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত। নিম্নবর্গের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধই সময়ে সময়ে উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্যকে ছাপিয়ে উঠত। আর তখনই নিম্নবর্গের রাজনীতি পেয়ে গেল স্বতন্ত্র মাত্রা।

> " 'সাবলটার্ন স্টাডিজ'এর ঐতিহাসিকরা দেখালেন যে শুধুমাত্র দেশীয় উচ্চবর্গের অঙ্গুলিহেলনে নিম্নবর্গের দল জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছিল, সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের এই অভিযোগ যেমন সত্য নয়, ... উচ্চবর্গ পরিচালিত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মঞ্চে নিম্নবর্গ প্রবেশ করেছিল ঠিকই ... কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা, পদ্ধতি ছিল উচ্চবর্গের তুলনায় পৃথক ... নিম্নবর্গের রাজনীতির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার রূপরেখা অনুসারে। সেই চেতনা গড়ে উঠেছে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে। দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ আর বঞ্চনার মধ্যেও নিজের অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার সংগ্রামের ভেতর দিয়ে ... ঐতিহাসিক নথিপত্রে নিম্নবর্গের চেতনার সরাসরি সাক্ষ্য প্রায় কোথাওই পাওয়া যায় না। কারণ সেই নথি তৈরি করেছে উচ্চবর্গেরা। ... একমাত্র একটি মুহূর্তেই শাসককূলের মানসপটে নিম্নবর্গ আবির্ভূত হয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছে। সেই মুহূর্তটি হল বিদ্রোহের মুহূর্ত।" [১০]

তবে নিম্নবর্গের চেতনার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেও এই ঐতিহাসিকরা দেখালেন সেই চেতনা পরাধীন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গ যেন নিষ্ক্রিয়, ভীরু, একান্ত অনুগত একটি স্বতন্ত্র জীব, তার নিজস্ব চালিকা শক্তি নেই। তাদের চালনা করে উচ্চবর্গের দমননীতি, যে-দমননীতি নেমে আসে ওপর থেকে নীচের দিকে। পুঁজিবাদী ঐতিহাসিক নিষ্ঠুরতায় সেই দমননীতির বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ছদ্মবেশ। কখনো সে সাংস্কৃতিক দমননীতি, কখনো সামাজিক দমননীতি কখনো অর্থনৈতিক দমননীতি আবার কখনো বা রাজনৈতিক দমননীতি। এ সব কিছুই হল কর্তৃত্ব, ক্ষমতা আধিপত্যবাদের পদ্ধতিগত বহিঃপ্রকাশ। সমালোচক বলেছেন—

"শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রভুত্বের অধিকারী শ্রেণী বা প্রভুশক্তি সবযুগেই একটা মতাদর্শের আবরণ তৈরি করে দেয়। এই মতাদর্শের আবরণকে বাইরের দিক থেকে রক্ষা করে তারই তৈরি করা রেজিমেণ্ট। এই রেজিমেণ্টই মানুষকে অধীনতার সম্পর্ক মান্য করতে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে বাধ্য করে। ... প্রভুত্ব যাদের মারে এবং কর্তৃত্ব যাদের ব্যবহার করতে করতে আর্থসামাজিক কাঠামোর তলানিতে পৌঁছে দিয়ে জীবনের স্বর ও সঙ্গতি কেড়ে নেয়, তারাই মূলত নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি" ১১

৪

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরাও পরবর্তী পর্বে কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হলেন, তাছাড়া তাঁদের নিজস্ব গবেষণার ভেতর থেকেও কিছু প্রশ্ন বা কিছু সমস্যা উঁকি দিল। আমরা দেখলাম সাবলটার্ন স্টাডিজ এর গবেষণা শুরু হয়েছিল কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক চেতনাহীন নিষ্ক্রিয় কৃষকের ধারণার বিরোধিতা করে সাবলটার্ন স্টাডিজ এর ঐতিহাসিকেরা দেখাবার চেষ্টা করেন যে বিদ্রোহী কৃষকচেতনা আসলে এক 'স্বকীয় সৃজনশীল এবং বিশিষ্ট চৈতন্যের অধিকারী'। সাবলটার্ন স্টাডিজ এর সমালোচকেরা বললেন—

❑ উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের রাজনীতি এরকম বিভাজন আসলে নানা ধরনের বিভেদকামী, বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিকে সমর্থন জানায়। আসলে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিম্নবর্গ-উচ্চবর্গ তো একসাথেই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তাহলে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই বিভাজন কেন?

❑ প্রগতিশীল সমালোচকদের মতে, মানবসভ্যতার ইতিহাস ছিল অনুন্নত আদিম, সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে উন্নত চেতনার দিকে। তাহলে উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন ক্ষমতাবান উচ্চবর্গের মতো নিম্নবর্গ চেতনার মানও তো ক্রমশ উন্নত হবে তাহলে সাবলটার্ন ঐতিহাসিকেরা কেন স্বতন্ত্রভাবে নিম্নবর্গের চেতনার উন্নতির কথা বলছেন? কেন তারা উচ্চবর্গের চেতনা উন্নত আর নিম্নবর্গের চেতনা পশ্চাৎপদ না বলে উচ্চবর্গ চেতনা ও নিম্নবর্গ চেতনা বলে দুটি স্বতন্ত্র বিভাজন করছেন?

❑ জাতীয়তাবাদী এবং মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা বললেন যদি স্বতন্ত্রভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনার প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয় তাহলে ঐক্যবদ্ধ জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা বাতিল হয়ে যাবে। আর নিম্নবর্গের নিজস্ব গড়ন, স্বতন্ত্র ভূমিকা, নিজস্ব রাজনৈতিক কার্যক্রমকে স্বীকার করলে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির বৈপ্লবিক প্রগতিশীল ভূমিকাকে সেখানে অস্বীকার করা হবে।

তবে এই সমালোচনা ও আক্রমণ কিন্তু নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক ভূমিকাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। নিম্নবর্গের ইতিহাস পরিণত হয় উচ্চবর্গের সমান্তরাল এক বিকল্প ইতিহাসে। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে এই বিকল্প সমান্তরাল ইতিহাস রচিত হলে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ভূমিকা স্বীকৃতি পাবে। তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে।

এইসব সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায় নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকেরা কিন্তু কোথাও প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রচনাপদ্ধতি, উচ্চবর্গের আধিপত্য অস্বীকার করেননি।

> ''সাবলটার্ন স্টাডিজ এর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখতে গিয়ে রণজিৎ গুহ লিখলেন, একজন সমালোচক আমাদের তিরস্কার করে বলেছেন, আমরা নাকি সব প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস রচনাপদ্ধতিরই বিরোধী। এ অভিযোগ সত্যি। নিম্নবর্গ যে তার নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে, এ-কথা স্বীকার করে না বলে ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞান চর্চার অধিকাংশ রীতিনীতি পদ্ধতিরই আমরা বিরোধিতা করি। এই বিরোধিতাই আমাদের প্রকল্পের চালিকা শক্তি।'' [১২]

তাহলে দেখা গেল সাবলটার্ন স্টাডিজ-র লেখকেরা প্রচলিত ইতিহাস বা গবেষণার ক্ষেত্র থেকে লেখকদের ভাবনাচিন্তার মোড় নতুন দিকে ঘুরিয়ে দিলেন বিকল্প ইতিহাস রচনার সাহায্যে। ইতিহাস নতুন ভাবে বিশ্লেষিত হল। নিম্নবর্গের নির্মাণ এর প্রয়োজনে পাল্টে গেল দৃষ্টিভঙ্গি, পাল্টে গেল বিশ্লেষণের ক্ষেত্র। কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে সাবলটার্ন স্টাডিজ চর্চা শুরু হলেও প্রথম পর্বে তা প্রচলিত ইতিহাসের এক বিকল্প মতবাদ হয়ে উঠেছিল। এতদিন মানব প্রগতির ইতিহাসে কৃষকদের কোনও আইডেনটিটি ছিল না। এই ঐতিহাসিকরা প্রশ্ন তুললেন নিম্নবর্গের যুদ্ধ আর বিদ্রোহকে ইতিহাস স্থান দিয়েছে ঠিকই তবে স্বীকৃতি দিয়েছে কতটা? এই স্বীকৃতির ব্যাপকতা প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা করলেন তাঁরা। অন্যদিকে ঐতিহাসিকরা এটাও দেখালেন যে কৃষকচেতনা নিয়ে ভাবনাচিন্তায় যদি আবেগ-রোমান্টিকতা কাজ করে তবে সেক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। এ প্রসঙ্গে ছয়ের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যায়। তাহলে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের কাজ হল, নিম্নবর্গের অর্ধস্ফুট অধীনতার চেতনাকে উন্মোচন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকল্প ইতিহাস রচনা করা। একাজে তাঁরা মানব সভ্যতার ইতিহাসকে পিরামিডের তলা থেকে দেখেছেন।

১৯৮৩ থেকে সাবলটার্ন স্টাডিজ এর ঐতিহাসিকরা একটা নতুন ডিসকোর্স উপস্থিত করলেন। নতুন ঐতিহাসিকরা পিরামিডের তলা থেকে ইতিহাস দেখা শুরু করলেন। ইতিহাসের অনেক অনাবিষ্কৃত কাহিনি উঠে এল ইতিহাসের পাতায়। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস চর্চায় যে-ভূমিকায়

সাবলটার্ন স্টাডিজকে গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা হল ‘এক ধরনের র‍্যাডিক্যাল’ সামাজিক ইতিহাস কিংবা ‘হিসট্রি ফ্রম বিলো’ তল থেকে দেখা ইতিহাস। এই তল থেকে দেখা ইতিহাসই ইতিহাসের পাতায় বাদ পড়ে যাওয়া অনেক ঘটনা, মতাদর্শ স্মৃতিকে খুঁজে বের করে এনেছিল। এই নতুন সামাজিক ইতিহাস মূল ধারার ইতিহাসকে অনেক জটিল করে তুলেছে। তাহলে সাবলটার্ন স্টাডিজ একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিল তা হল সামাজিক বিন্যাস, ইতিহাস কিংবা সাহিত্য ক্ষেত্রে ‘তল থেকে দেখার প্রবণতা’।

সাবলটার্ন স্টাডিজ এর প্রথম পর্বের কাজের সবচেয়ে মৌলিক সমালোচনা করেছিলেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, — তাঁর Subaltern studies : Deconstructing Historiography প্রবন্ধে তিনি তুলে আনলেন সাবলটার্ন স্টাডিজ এর কয়েকটি দিক— যথা

→ Change and crisis

→ Cognitive Failure is Irreducible

→ Subaltern studies and the European critique of Humanism

→ The problem of Subaltern consciousness

→ Historiography as strategy

→ Rumour

→ Woman — (i) concept-metaphors of territoriality and of woman
(ii) The communal mode of power and the concept of woman [১৩]

আর তাঁর ‘Can the Subaltern Speak?’ প্রবন্ধে তিনি বললেন আধিপত্যবাদীরা চিরকালই নিম্নবর্গীয় অপর বা others দের self’s shadow হিসাবেই নির্মাণ করেছেন। তাই নিম্নবর্গীয় ‘অপর’দের কণ্ঠস্বর বা চেতনাকে সাহিত্য বা ইতিহাস থেকে সার্বিকভাবে তুলে আনা সহজ নয়।

> “... In the face of the possibility that the intellectual is complicit in the persistent constitution of other as the self’s shadow, a possibility of political practice for the intellectual would be to put the economic under erasure, to see the economic factor as irreducible as it reinscribes the social text, even as it is erased, however imperfectly, when

it claims to be the final determinant or the transcendental signified.” [১৪]

গায়ত্রী চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে এই প্রশ্ন তুললেন যে মার্কসবাদী ধারণায় কিংবা মিশেল ফুকো প্রমুখের ভাবনায় যারা ‘oppressed’ তারাও যখন সুযোগ পায় ‘Can speak and know their condition’. তিনি বললেন—

“According to Foucault and Deleuze (in the first World, under the standardization and regimentation of socialized capital, though they do not seem to recognize this) the oppressed, if given the choice (the problem of representation cannot be bypassed here), and on the way to solidarity through alliance politics (a Marxist thematic is at work here) can speak and know their conditions.” [১৫]

উল্লিখিত দুটি প্রবন্ধে গায়ত্রী চক্রবর্তীর সমালোচনা থেকে উঠে আসা সাবলটার্ন স্টাডিজ এর দুটি বৈশিষ্ট্য—

(i) ‘ঔপনিবেশিক শাসন যন্ত্রের যা পরিধি নিম্নবর্গের রাজনীতি তার বাইরেও বটে আবার ভেতরেও বটে। যে অর্থে তা বাইরে, সেই অর্থে নিম্নবর্গের রাজনীতি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা ভাবাদর্শের তুলনায় স্বতন্ত্র। কিন্তু তা আবার ভেতরেও বটে কারণ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে নিম্নবর্গের রাজনীতি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, তাকে সুবিধামতো ব্যবহার করছে, হয়তো বা একরকমভাবে আত্মস্থ করছে।’

(ii) ‘একদিকে নিম্নবর্গীয় সত্তা বা চৈতন্যের একটা বিশুদ্ধ আকৃতির ধারণা, অন্যদিকে ঐতিহাসিক মালমশলায় বারেবারেই এটা আবিষ্কার করা যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি ঘটেছে বিভিন্ন আকারে, বিভিন্ন চেহারায়, এমনকি নিজের ভেতরেই বিভাজিত অবস্থায়’

গায়ত্রী চক্রবর্তী প্রশ্ন তুললেন—

“ইতিহাস রচনার প্রতিটি উপাদানই যখন দেখিয়ে দিচ্ছে যে নিম্নবর্গ মানেই ‘কোনও এক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি’ তখন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের এত ঘটা করে বিশুদ্ধ কৃষক চৈতন্য অথবা একান্তভাবে স্বতন্ত্র নিম্নবর্গের রাজনীতির স্লোগান আওড়াতে হচ্ছে কেন? ... আসলে তো ঐতিহাসিক নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করেছে মাত্র। নিম্নবর্গকে ইতিহাসের পাতায় উপস্থিত করেছেন।” [১৬]

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে গায়ত্রী চক্রবর্তী তাঁর প্রবন্ধে বললেন ‘সবার ওপরে নিম্নবর্গ সত্য’ এরকম মন্ত্র না আউড়ে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের চেষ্টা করা উচিত উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নিম্নবর্গ

নির্মাণ প্রক্রিয়ার গভীর অনুসন্ধান করা। ইতিহাসের হাজার কণ্ঠস্বরের ভেতর থেকে নিম্নবর্গ কণ্ঠকে আলাদা করে বের করে আনার চেষ্টা করা। কারণ ইতিহাস থেকে নিম্নবর্গের যে-কণ্ঠস্বর উঠে আসে তা নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠাকারী স্বর নয় তা 'অন্যের নির্মাণ'। তাই নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বরকে প্রতিষ্ঠা দানের জন্য প্রয়োজন সমষ্টিগত চেতনার। কারণ— 'Subaltern consciousness as emergent collective consciousness' তাহলেই উচ্চবর্গের নির্মাণের খোলসটা খসে পড়বে, প্রকৃত নিম্নবর্গের স্বরূপ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। এর জন্য প্রয়োজন নিম্নবর্গের 'নির্মাণ প্রক্রিয়ার' অনুসন্ধান, যাকে তিনি বলেছেন "Affirmative deconstructions"[১৭] এভাবেই সাবলটার্ন স্টাডিজ একটা নতুন অনুসন্ধানের পথ খুলে দিল।

এখন আর নিম্নবর্গের প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণই একমাত্র লক্ষ্য থাকল না। তাঁরা অন্বেষণ করলেন 'নিম্নবর্গকে রি-প্রেজেন্ট করা হয় কিভাবে? রি-প্রেজেন্ট কথাটা এখন প্রদর্শন করা আর প্রতিনিধিত্ব করা উভয় অর্থেই প্রযোজ্য'। গবেষণার পদ্ধতি অনেক বদলে গেল, গবেষকের ঝোঁক গিয়ে পড়ল টেক্সট্ বা পাঠ্যবস্তুর খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের দিকে। সাবলটার্ন স্টাডিজ এর বিষয়গত নির্দিষ্ট সীমারেখা আর থাকল না। তাহলে সাবলটার্ন স্টাডিজ এর অন্যতম প্রবক্তা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মনে করলেন নিম্নবর্গ তার নিজের কথা কখনোই বলতে পারবে না। নিম্নবর্গের কথা নিম্নবর্গের হয়েই ইতিহাসকাররা ইতিহাসের পাতায় তুলে আনলেন রাজনৈতিক সদিচ্ছা থেকেই। তিনি উচ্চবর্গের 'মানব' ও 'আদর্শ নাগরিক' এর স্থানে নিম্নবর্গকে বিকল্প নায়ক করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চাইলেন উচ্চবর্গের অপর (other) স্বর হিসাবে নিম্নবর্গকে প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি বললেন যেহেতু ইতিহাসের হাজার কণ্ঠস্বরের ভেতর থেকে নিম্নবর্গের স্বরকে তুলে আনা সম্ভব নয় কারণ তা অন্যের নির্মাণ, তাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের কাজ হবে এই নির্মাণের সামাজিক পদ্ধতিগুলি, প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠানগুলিকে আবিষ্কার করা।

নিম্নবর্গের পাঠকৃতিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হল এর দ্বিতীয় পর্ব থেকে (পঞ্চম-ষষ্ঠ খণ্ড)। এই পর্বে নিম্নবর্গের চেতনার বিশুদ্ধ রূপদান বাদ দিয়ে নিম্নবর্গ চেতনার বিভিন্ন উপাদান আবিষ্কার করলেন তাঁরা। বিভিন্ন উপাদান আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে, নিম্নবর্গের ইতিহাস যেভাবেই লেখা হোক না কেন তা আংশিক অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন। বোঝা গেল এ পর্যন্ত নিম্নবর্গ ভাবনার ভেতর রোমান্টিকতার আবেশ মিশেছিল। তাই এবার খোঁজা হল নিম্নবর্গের স্বরূপ। কীভাবে নিম্নবর্গকে প্রদর্শন করা হয় নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব করা হয় কীভাবে। উচ্চবর্গের পাঠকৃতি থেকে নিম্নবর্গের স্বর আবিষ্কারের চেষ্টা চলল। বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ পুঁথি, ধর্মচর্চা এমনকি গোষ্ঠীর সমাজবিধি নিয়ে চলল গবেষণা কারণ এসবের ভেতরেই আত্মগোপন করে থাকে 'উচ্চবর্গের প্রভাবশালী ডিসকোর্স'। আসলে 'নিম্নবর্গের নির্মাণ' এই পদ্ধতির আবিষ্কারের পর

নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকের কাজ আর নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র ক্রিয়াকলাপের বিবরণ দেওয়াতে সীমাবদ্ধ থাকল না। সমগ্র সমাজ প্রতিষ্ঠান ও ভাবাদর্শের জগৎকে এখন নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হল।

> " 'নিম্নবর্গের নির্মাণ' এই প্রশ্নটি সামনে রাখার ফলে এবার ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা এবং আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠান গড়ার জটিল ইতিহাসের দলিল সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পড়ার প্রয়োজন দেখা দিল, ফলে ঔপনিবেশিক শাসনযন্ত্রের প্রসার, ইংরেজি শিক্ষা, তথাকথিত নবজাগরণ, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ— এই সব বহু চর্চিত বিষয় নিয়েও সাবলটার্ন স্টাডিজ-এ নতুন আলোচনা শুরু হল। সেই সঙ্গে নজর গিয়ে পড়ল আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর, যার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান-সঞ্চারিত মতাদর্শ এবং আধুনিক ক্ষমতাতন্ত্র ঔপনিবেশিক এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতবর্ষে তার জাল বিস্তার করেছে। অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, সংবাদপত্র, প্রকাশন সংস্থা, হাসপাতাল-ডাক্তার-চিকিৎসা ব্যবস্থা, জনসংখ্যা গণনা, রেজিস্ট্রেশন, লাইসেন্স, আধুনিক শিল্প উৎপাদনে দৈনন্দিন শ্রম সংগঠন, বিজ্ঞান সংস্থা, গবেষণাগার— এইসব প্রতিষ্ঠানের বিশদ ইতিহাসও এবার সাবলটার্ন স্টাডিজএর বিষয় হয়ে পড়ল।"[১৮]

পরবর্তীকালে সাবলটার্ন স্টাডিজ ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে পড়ল। নিম্নবর্গের ইতিহাস, গবেষণাগারে ক্রমশ 'ভদ্রলোকের ইতিহাস' হয়ে গেল। গবেষণা-কেন্দ্র থেকে অসংখ্য বিষয় কেন্দ্রিক চর্চার মধ্যে উঠে এল সাবলটার্ন স্টাডিজ। যথা— বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি। তবে সাবলটার্ন স্টাডিজের মধ্যে বিকল্প কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণের কর্মসূচি পাওয়া গেল না।

সাবলটার্ন স্টাডিজ এর আলোচনা তিনটি সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করল (ক) সাম্প্রদায়িকতা, (খ) জাতিভেদ প্রথা, (গ) মহিলাদের সামাজিক অবস্থান।

প্রথম আলোচনায় দেখা গেল যে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে বিবাদমান দুটি গোষ্ঠী হিন্দুত্ববাদী ও সেকুলারপন্থী বা রাষ্ট্রক্ষমতাকে করায়ত্ত করে রাখার জন্য দুধরনের কৌশল নিয়েছে আর নিম্নবর্গ এই কৌশলী আধিপত্যের মোকাবিলা করেছে নিজেদের মতো করে।

দ্বিতীয়টিতে দেখা যায় জাতপাতের আইডেনটিটিতে রাজনীতি এখন বেশ সক্রিয় ও স্পষ্ট। তাই জাতিভেদ প্রথার ধর্মীয় ভিত্তি এখন বেশ দুর্বল। এখানেও নিম্নবর্গ প্রতিস্পর্ধী ভূমিকা পালন করে।

তৃতীয় আলোচনায় দেখা যাচ্ছে পুরুষ শাসিত সমাজে শ্রেণিগত, জাতিগত সম্প্রদায়গত পরিচয় থাকলেও সকল নারীই নিম্নবর্গ। তবে সেখানেও আছে উচ্চ-নীচ স্তরভেদ। শ্রেণি, জাতি,

সম্প্রদায় বিশেষে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা নির্ভর করে। তাই নিম্নবর্গের নারীর নির্মাণ বেশ জটিল এবং বিশ্লেষণের বিষয়।

পরিশেষে বলা যায় নিম্নবর্গের পাঠকৃতি প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে Counter Hegemony-র কথা বলল আর ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে যে Counter Ideology -র পথ খুলে দিল তা সবসময়ই পরিবর্তনশীল ও সচল।

এই পর্যন্ত আলোচনা হল নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার। এখানে স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার তাহলে নিম্নবর্গ আমরা কাদের বললাম আর আমাদের সমাজজীবনে তাদের অবস্থান কোথায়।

৫

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সম্মিলনের পরেও দেখা যায় বিভাজন। আদিম স্তরে কর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। আর্য সভ্যতার অভ্যুদয়ে কর্মের ভিত্তিতে যারা ‘দস্যু’ তারাই পরবর্তীকালে ‘দাস’এ পরিণত হয়েছিল। সমাজের বর্ণভেদে এরাই অসাম্যের বলি হয়েছে, সমস্ত রকম বঞ্চনার শিকার হয়েছে। বর্ণবৈষম্যের কারণেই আর্থ-সামাজিক শিক্ষা-সংস্কৃতি সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে, এরাই মূলত নিম্নবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর যারা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম আদিবাসী, সমাজের নীচু স্তরে বসবাসকারী মানব গোষ্ঠী তারাও সমাজে বর্ণগত, গুণগত, জাতিগত, পেশাগত, বিত্তগত কারণে সমাজের নীচুতলাতেই থেকে গেছে। কিন্তু বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে নিম্নবর্গের চেহারা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। একদল বা গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ আজ বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। একদিকে অট্টালিকা অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর বস্তি। কিছু মানুষের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার পাশে অসংখ্য গৃহহীন, অভুক্ত রোগক্লিষ্ট, কুসংস্কারগ্রস্ত অশিক্ষিত মানুষের মুখ। এই অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত ধর্মান্ধতার বলি অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য শ্রেণি মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, পিছিয়ে পড়া, এরা অনুন্নত বা নিম্নবর্গ। মনুসংহিতার নির্দেশকাল থেকে শুরু করে এই উত্তর-ঔপনিবেশিক কাল পর্যন্ত দেশের একটা বৃহদংশের মানুষকে বারবার নানা কৌশলে নিম্নবর্গে পরিণত করা হয়েছে। তাহলে বলা যায়— আমাদের সমাজ-জীবন থেকে দূরবর্তী অংশের মানুষ যারা তাদের সঙ্গে সমাজের বিভাজন রেখাটি স্পষ্ট। সেই শ্রমজীবী গরিব মানুষগুলিই শ্রমে-রক্তে-ঘামে সমাজ-কাঠামোকে যুগ যুগ ধরে মজবুত বনিয়াদের ওপর স্থাপিত করেছে এবং তার গতি ও প্রগতিকে অব্যাহত রেখেছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার যে তারাই এ সমাজে চরম অপমান ও অসম্মানের, বঞ্চনা ও পীড়নের শিকার। স্পষ্টত দুই প্রান্তের মানুষ,— উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গ বহুযুগ ধরে পাশাপাশি বাস করে

এসেছে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনও ঐক্যবিন্দু নেই; আছে বৈরিতা ও বিরোধ, শোষণ ও শাসন। এই অদৃশ্য সামাজিক বিভাজন রেখার নীচে যারা, যারা প্রান্তে আছে সেই প্রান্তবাসী গরিব মানুষদেরই আমরা নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী বলে সাধারণভাবে এখানে চিহ্নিত করছি।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে কিছু কথা বলে নেওয়া এখানে জরুরি, আমাদের আলোচনায় নিম্নবর্গ কথাটির সঙ্গে প্রান্তিক বা প্রান্তবাসী কথাটিও এসে যাচ্ছে। বলে নেওয়া দরকার কথাদুটি সমার্থক নয়। ইংরেজী margin এবং marginal শব্দের বাংলা পরিভাষা করা হয় প্রান্তিক বা প্রান্তবর্গ। marginality বা প্রান্তিকতা এটি একটি বিমূর্ত ধারণা। প্রান্তবর্গ বা প্রান্তিক বলতে, ক্ষমতা-আধিপত্য; প্রভুত্ব-অধীনতা বৃত্তের প্রান্তে বা পরিধিতে থাকা ব্যক্তিগোষ্ঠী বা জনজাতিকেই বোঝায়। নিম্নবর্গ ও প্রান্তবর্গ দুটি ধারণা সমার্থক নয়। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে আবার একটি গভীর সম্পর্কও আছে। বলা যায় সব প্রান্তিক মানুষই নিম্নবর্গ কিন্তু সকল নিম্নবর্গের মানুষই প্রান্তিক নয়। আসলে প্রান্তবর্গ হল নিম্নবর্গের অংশবিশেষ। প্রান্তবর্গ একটি অংশ কখনোই তা সমগ্র নয়। নিম্নবর্গের অবস্থান উচ্চবর্গের বিপরীতে। প্রান্তবর্গের অবস্থান উচ্চবর্গ পরিচালিত মূলস্রোতের বিপরীতে। তবে আধিপত্য ও প্রভুত্ব স্থাপনের ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের কাছে প্রান্তবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। উচ্চবর্গের নিয়ত আগ্রাসনকারী সভ্যতার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিয়ত নিপীড়িত ও শোষিত হতে থাকে প্রান্তবর্গ। এর ফলে আসে বিচ্ছিন্নতা, মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন প্রান্তবর্গ খোঁজে নিজস্ব অস্তিত্ব। মূলস্রোতের সামগ্রিক সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরে বিন্যস্ত এই প্রান্তবর্গ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় নিম্নবর্গও অসংখ্য ক্ষুদ্র স্তরে বিভাজিত। নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চাও এই দ্বিবর্গীয় বিভাজনের তত্ত্বকে সমর্থন করে। প্রান্তিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে এই বিচ্ছিন্নতার আধারেই। বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ বদলের প্রসঙ্গেই মূলস্রোতের সঙ্গে প্রান্তবর্গের সম্পর্কও বদলে যায়। মূলস্রোতের সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন জনজাতি ও এই প্রান্তবর্গীয় সম্প্রদায় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যন্ত প্রান্তগুলিতে নাঢ়াবইহার আর মোহনপুরা অরণ্যানীর দোবরু পান্না-ভানুমতি বা বীরসা-ধানী-চোটীমুন্ডাদের মতো আরো অনেক জনজাতি রয়েছে যারা মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মধ্যে তাদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু মূলস্রোতের সভ্যতা তা হতে দেয় না। এখানেই বিরোধের উৎপত্তি। এর ফলেই বীরসা মুন্ডাদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আবার মূলস্রোতের আগ্রাসনের প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে মাদারি-বাঘারুদের আরও প্রত্যন্ত প্রান্তরে অগ্রসর হয়ে নতুন উপনিবেশের সন্ধান করতে হয়। এভাবেই একদিন নিম্নবর্গের একাংশের মধ্যে প্রান্তিক চেতনার উন্মেষ ঘটে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবনায় প্রান্তিক বা মারজিন্যাল শব্দ থেকে প্রান্তিক বা মারজিন্যালিটি শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। বস্তুত প্রান্তিক শব্দটির অর্থ যা প্রান্তে অবস্থান করে। আজকের মানব সমাজ প্রতাপ (hegemony) অর্থাৎ প্রভুত্বকারী শক্তির দ্বারা কেন্দ্র-পরিধির বিভাজনে বিভাজিত। এটা এক ধরনের বৈপরীত্যমূলক বা বাইনারি ভাবনার জন্ম দেয়। এই ভাবনা কৌশলে প্রোথিত হয় ব্যক্তি তথা সমাজের মন ও মননের মধ্যে। সেখানে কেন্দ্রের আধিপত্য অটুট থাকে। কিন্তু আধুনিক উত্তর পর্বে কেন্দ্র ও পরিধির অবস্থান আর আগের ভাবনা অনুযায়ী থাকে না। কারণ ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসে বারবার পরিধি ক্ষমতাতন্ত্রের বিরোধিতা করেছে কেন্দ্রের আধিপত্যকে খর্ব করতে চেয়েছে। এই জন্য আধুনিক উত্তর পর্বে ক্ষমতাকেন্দ্র আর স্থির নির্দিষ্ট থাকল না। পূর্বের শোষণ শাসনের সহজ কৌশল ত্যাগ করে রহস্যময় জটিল স্পষ্টতাহীন, বহুমাত্রিক পদ্ধতি কার্যকর হল। এভাবেই আরও একটি তত্ত্বের জন্ম হয়ে গেল আর সেই তত্ত্বের আলোতেই সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, শিল্পী সাহিত্যিক অন্বেষণ করে চলেছেন জীবনের অন্তর্নিহিত অন্য আর এক সত্যকে। কারণ যারা প্রত্যন্তচারী তারাই অন্তর্বর্তী পৃথিবীর সত্যকে লাভ করার যোগ্য। পৃথিবীর জীবনের সৃষ্টির একেবারে প্রান্তে এসে যে দাঁড়াতে পেরেছে তার দৃষ্টিতেই কেবল সেই প্রান্তের অন্তর্বর্তী পৃথিবী কীরকম তার সত্যরূপ উন্মুক্ত। এভাবে তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে, আজকের জটিল সময়। জীবনকে যেমন একটি তত্ত্বের ছাঁচে ঢেলে সাজানো যায় না তেমনি তত্ত্ব ছাড়া জীবনের কোনও মানেও হয় না। তাই নিম্নবর্গীয় তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে, সময়-সাহিত্য-সমাজ ও নিম্নবর্গের জীবন।

৬

পূর্বের সূত্র ধরে বলাই যায় নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার অনুসঙ্গ হিসাবে প্রভুত্ব/অধীনতার বা উচ্চবর্গীয়/নিম্নবর্গীয় দ্বন্দ্ব ইতিহাসচর্চার পরিধি ছাড়িয়ে বিশ শতকের শেষভাগে অন্যান্য সামাজিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। নিম্নবর্গ পরিভাষাটি তার আদি-কৌলিন্য হারিয়ে একটি বিশিষ্ট ধারণা হিসেবে স্বতন্ত্র দ্যোতনা পায়। এবং বাংলা সাহিত্য আলোচনাতেও নিম্নবর্গীয় বিচারের প্রকল্প প্রবর্তিত হয়। এভাবে বাংলা সাহিত্যের বিচার কিংবা বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশিষ্ট সাহিত্যকর্মের আলোচনায় নিম্নবর্গীয় তত্ত্বকে যেমন গ্রহণ করে তেমনি ‘নিম্নবর্গ’ পরিভাষাটি তার আদিরূপ পাল্টে গরিব, বঞ্চিত, শোষিত ও প্রান্তিক মানুষের সাধারণ সংজ্ঞা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর লেখক ও তাদের লেখার, স্রষ্টা ও সৃষ্টির নতুন মূল্যমান নির্ধারণ শুরু হয়। সেখানে কিন্তু প্রথাগতভাবে প্রযুক্ত না হলেও নিম্নবর্গীয় চেতনা বা উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব কিংবা সামাজিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্ষমতার বিন্যাস ইত্যাদি কোনও কিছুই অনুক্ত থাকে না। লেখা ও

লেখকদেরও নিম্নবর্গীয় ধারণার আধারে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীভুক্ত করে নেওয়া শুরু হয়ে যায়, সমাজ সংগঠন, দৃশ্য-অদৃশ্য শোষণের বেড়াজাল, দেশ ও কালের শর্ত, সামাজিক রাজনৈতিক বিন্যাস, ইতিহাস ও পুরাণকথা, মিথ ও কিংবদন্তি কিংবা শ্রেণিপক্ষপাত, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি শর্তের বিচারে কোনও লেখককে বাস্তববাদী আখ্যা দেওয়া হয় কেউ বা বিবেচিত হয় প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা মানবতাবাদী হিসাবে। এই গোষ্ঠী বর্ণ বিভাজনের খেলা ক্ষেত্রবিশেষে আত্মঘাতীও হয়; কিন্তু একে উপেক্ষা করাও যায় না। তবে লেখকের শ্রেণিপক্ষপাত ও দৃষ্টিভঙ্গি— কী চোখে তিনি দেখছেন প্রান্তিক গরিব মানুষের অভাব-অনটন, চাষির বুকভাঙা হা-হুতাশ, অসহায় উৎপীড়িতা নারীর কান্না, কিংবা কে কার মেহনতের ফসল কেড়ে খাচ্ছে— এ থেকেই এক শ্রেণির লেখকের সাধারণ পরিচয় মেলে। এদের নিয়ে যাঁরা লেখেন তাদের এঁরা আখ্যানে সাজিয়ে গুছিয়ে হাজির করেন না। স্বপ্নময় কল্পনায় গড়া কোনও চরিত্র-বিম্বও এরা নয়। এরা হাজারো গড়-মানুষের নানা উপকরণ জুড়ে একজন বিশেষ মানুষ, এরা আছে নানা স্বরূপে, এরাই নিম্নবর্গের মানুষ, এরাই প্রতাপের রাজনীতির শিকার।

আমরা দেখলাম—ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি সব ক্ষেত্রেই সাবলটার্ন বা নিম্নবর্গীয়তত্ত্ব বিশ্লেষিত হতে পারে। এখন দেখা যাক, 'সাহিত্যে' সাব-অলটার্ন ঠিক কোন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। আমাদের সাহিত্যে সেই চর্যাপদের কাল থেকেই নিম্নবর্গ জীবনচিত্র প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। ধর্মের পথ ধরে রূপক আবরণের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে জাগতিক মানুষের জীবনযাত্রার টুকরো টুকরো ছবি। জল-অচল অন্ত্যজ মানুষগুলির জীবন্ত রূপচিত্র এই পদগুলি। উন্মেষপর্বের এই বাংলা সাহিত্যেই পাওয়া যায় নিম্নবর্গীয় জনজাতির আদিম অবস্থার খোঁজ। চর্যার জীবন হল অতিসাধারণ মানুষের জীবন। বলা যায় চর্যার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রগুলো নীচুতলার গ্রামভারতের মানুষ। চর্যাপদই আমাদের প্রথম বলে, শবর, ডোম, পুলিন্দ, ধীবর, নিষাদ প্রভৃতি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা। কৃষিকেন্দ্রিক পল্লিসমাজ-জীবনে উচ্চবর্গ এই নিম্নবর্গের মানুষগুলির ওপর নির্ভর করেই জীবন ও জীবিকা অতিবাহিত করত। আবার দেখা যায় এইসব নিম্নবর্গের জনজাতির মানুষগুলির বর্ণাশ্রম প্রথাশাসিত সমাজজীবনে স্থান হত নগরের বহির্দেশে। উচ্চবর্গের তাচ্ছিল্যে দূরে সরে থাকা মানুষগুলির আবার সময়-বদলের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থানগত ভূমিকার বদল ঘটে। তুর্কি-বিজয়ের পরে নতুন সমাজ-বিবর্তনের ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উচ্চবর্গের মানুষেরা বুঝতে পেরেছিল, এই বৃহত্তর নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীজীবনকে উপেক্ষা করে ইসলামের সমান্তরাল শক্তি হিসাবে হিন্দুধর্মকে বাঁচানো সম্ভব নয়। কারণ এখানে সাবলটার্নের সংজ্ঞাটা বদলে গিয়েছিল। একদিন যারা ছিল উচ্চবর্গের মানুষ তারাই তুর্কী-বিজয়ের পর হয়ে গেল 'সাব-অলটার্ন' নিম্নবর্গ। সময়-দেশ-কালের প্রেক্ষিতে আধিপত্যকারীর অবস্থান বদলে

গেল। এল মঙ্গলকাব্য, অনুবাদকাব্যের ধারা। উঠে এল গোপ বালক বালিকা কৃষ্ণ-রাধা, কালকেতু-ফুল্লরা, কালুডোম, লখাই, নেতা ধোপানী, গুহক, একলব্য, অন্নদামঙ্গলের ভিখারি শিব, ঈশ্বরী পাটনী, ভারতীয় লোকজীবন থেকে উঠে-আসা এই সব চরিত্র।

উনিশ শতকের নবজাগরণের স্পর্শে আবার প্রভুত্বের-আধিপত্যের রদবদল ঘটে সাবলটার্নের ধারণাও বিবর্তিত হয়। সমাজের মূলস্রোতের মানুষ উপলব্ধি করল জাতির জাগরণ না হলে কখনও ব্যক্তির জাগরণ হবে না। তাছাড়া এককের জাগরণে বহুর উপকার নেই। কারণ তখন— 'উপনিবেশবাদের কবলে পড়ে একক এবং বহু উভয়েই Colonised'। ইংরেজ উপনিবেশে ক্যাপিটালিজমের সর্বগ্রাসী প্রসারে ভূমিজীবী-শ্রমজীবী, সম্ভ্রান্ত-জমিদার সকলেই ইংরেজের অধীনস্থ সাবলটার্ন। তারপর কোনও একদিন আসে 'উল্টোরথের পালা'। মাথা তুলে দাঁড়ায় সাবলটার্ন। ক্ষমতাভোগীদের ক্ষমতা চূর্ণ হয়। 'উঁচুতে নিচুতে' হয় বোঝাপড়া। 'রথের রশি' নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন—

> তারপরে কোনো এক যুগে কোনো একদিন
> আসবে উলটো রথের পালা।
> তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে
> নিচুতে হবে বোঝাপড়া। ...
> আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
> যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
> তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

৭

বিশ শতকে সুবিধাবাদী ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্য দেশগুলি বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তাদের ক্ষমতার থাবা গুটিয়ে নেয়। কিন্তু তলায় তলায় প্রচ্ছন্নভাবে কার্যকরী থাকে তাদের শোষণের প্রক্রিয়া, শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় শিল্পোৎপাদনের প্রসার বাড়ে, ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ অসংলগ্নভাবে আধিপত্যের শিকার হয়। নব্য উপনিবেশে জাতি, শ্রেণি, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক অবস্থান অনুসারে নিম্নবর্গের চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের বিভেদ সৃষ্টি করেছে ধর্ম-বর্ণ। ঔপনিবেশিক যুগে এই ভেদপ্রবণতাকে চালনা করেছে, সমর্থন করেছে শিক্ষা আর আজকের এই উত্তর-ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে ভেদপ্রবণতার তাত্ত্বিক ভাষ্য তৈরি করেছে প্রতারক অর্থনীতি। তাই বলা যায়—

"... নিম্নকোটির সমাজশ্রমিক হিসেবে নিম্নবর্গের বা এই আপাত নান্দনিক বিশ্ব দ্বারা যুগ যুগ ধরে কেবল ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র, কিন্তু তাদের শিকড়? তাদের অস্তিত্ব? ভারতীয় সমাজকাঠামোর কোথাও আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির স্বাদ পায়নি। এমনকি আজ যে বিশ্বায়নের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র, আজ যে শিল্পায়নের জোয়ারে ভাসতে চাইছে এই দেশ এই সমাজ— তার ফলেও সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু অবদমিত চিরকালের নিম্নবর্গই।" [১৯]

এভাবেই চোরাস্রোতে চলছে নিগ্রহ, বঞ্চনা, শোষণ আর একইসঙ্গে তাকে নতুন রূপে শনাক্তকরণের অভিপ্রায়। নিম্নবর্গীয় তত্ত্বটিও তার আদি সংরূপ হারিয়ে নতুন নতুন অর্থ পরিগ্রহণ করছে ক্রমশ। কারণ কোনো একটি সংরূপ সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য আন্দোলনে বিশেষ অনড় তত্ত্বের মধ্যে ফ্রেম-বন্দি থাকতে পারে না। নিম্নবর্গীয় তত্ত্ব প্রসঙ্গেও একথা সমান সত্য। আজ আমরা দেখি যে অন্যের দ্বারা পীড়িত সেও সুযোগ বুঝে আর একজনকে শোষণ করছে নির্বিচারে। এভাবে নীচুতলা থেকে আরও নীচুতলা বিরামহীন ভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে শাসাতে থাকে। তাই নিম্নবর্গ বিষয়টি আর শুধুমাত্র বর্ণ-ধর্ম-জাতি-কর্মের ভেতর বদ্ধ নেই বরং তা পারস্পরিক বৈপরীত্যের সম্পর্কে গ্রথিত। বলা যায় এটা কোনও দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি নয়। বিশ্বায়নের বিশ্বব্যাপ্ত ধারণায় সামন্ততান্ত্রিক প্রভুর চরিত্র গিয়েছে বদলে। যন্ত্রসভ্যতায় একই পোশাকে বণিক-ব্রাহ্মণ-পাচক-পুরোহিত-গণিকা-আধুনিকা-চণ্ডালিকার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। একেই বলা হয় 'নয়া সাম্যবাদ'। সমালোচকের ভাষায় বলতে পারি—

"ইতালির কমিউনিস্ট নেতা গ্রামসির দর্শনে যাহা সাবলটার্ন তাই ভারতীয় পরিভাষায় যে কালে 'নিম্নবর্গীয়' উপাধি ধারণ করল তখন কিন্তু সমাজের চেহারাটা ক্ষমতা নবীকরণের অধ্যায়টা শাখা ছড়িয়েছে অনেক দূর। মাল্টিপ্লেক্স, মাল্টিমিডিয়া, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির মতো 'নিম্নবর্গ' শব্দসমাহারের অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে আসছে বহুমুখ। বহুবিধ কণ্ঠস্বর সেখানে কেবল কৃষক-শ্রমিক-দিনমজুর বা সাঁওতাল-আদিবাসী-ডোমকাহার-দোসাদ-ভাঙ্গি-মাঙ্গ এমনকি মণ্ডল-মাহাতোদেরই নিম্নবর্গীয় বলে চিহ্নিতকরণ সম্ভব নয়। গভীরে খতিয়ে দেখলে বলা যায় চাতুর্যে বা পদমর্যাদায় যে খাটো, অর্থে ও কৌলিন্যে যে কমজোরি, ক্ষমতা এবং প্রভুত্ব থেকে অনেক দূরে যার অবস্থান নেতিবাচক তকমাটি জুড়ে যেতে পারে তেমন যে-কারো ক্ষেত্রে। হতে পারেন তিনি পুরুষ, হতে পারেন মহিলা, হতে পারেন ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ... হতে পারেন অব্রাহ্মণ অজ্ঞাতকুলশীল যে কেউ"[২০]

সবশেষে একথা বলা যায় যে, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসও ধারাবাহিক ভাবে এই তত্ত্বগত বিবর্তনের ধারক, বাহক। পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে সেই ধারাবাহিক বিবর্তন, বিবর্তনের স্মারক উপন্যাস ঔপন্যাসিক আর তার পাঠক-প্রতিক্রিয়া। এই অধ্যায়ে কেবল নিম্নবর্গের সংজ্ঞা স্বরূপটিই স্পষ্ট করে নেওয়া হল মাত্র।

তথ্যসহায়কসূত্র

১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাস, সম্পাদনা গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'ভূমিকা : নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস'। পৃষ্ঠা—৪।

২. ঐ, পৃষ্ঠা—৪-৫।

৩. 'সন্ধান' A mulit-disciplinary Bi-Lingual Rsearch Journal on The Socio-Cultural and Literary aspect, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০১৩, নিম্নবর্গ, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা—৭২।

৪. ঐ পৃষ্ঠা—৭৩।

৫. সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত, বুদ্ধিজীবীর নোটবই, পুস্তক বিপণি, ২০১১ খ্রি. কলকাতা, পৃষ্ঠা—৪৫৪।

৬. নিম্নবর্গের ইতিহাস, ঐ, পৃষ্ঠা—১২।

৭. ঐ, নিম্নবর্গের ইতিহাস, রণজিৎ গুহ, পৃষ্ঠা—৩৮-৩৯।

৮. 'Key Concepts in Post Colonial Studies', Bill Ashchroft, Gareth Griffiths, Hellen Tiffin, Routledge, 1998, Page-16.

৯. 'The Post Colonial Studies Reader' ed. by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, London, 1995, 'Can the Subalter Speak' - Gayatri Chakraborty Spivak, Page-26.

১০. নিম্নবর্গের ইতিহাস, ঐ পৃষ্ঠা—১১-১২।

১১. জহর সেন মজুমদার, নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৭, পৃষ্ঠা—১৩।

১২. নিম্নবর্গের ইতিহাস, ঐ, পৃষ্ঠা—১৪।

১৩. Selected Subaltern Studies, Edited by Ranjit Guha and Gayatri Chakraborty Spivak, OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, oxford 1988, 'Subaltern studies : Deconstructing Historiography' : Gayatri Chakraborty Spivak.

১৪. 'Can the Subaltern Speak', Ibid, page-24.

১৫. Ibid, page-25

১৬. নিম্নবর্গের ইতিহাস, ঐ, পৃষ্ঠা—১৬-১৭।

১৭. Selected Subaltern Studies, Ibid, Introduction, page-16.

১৮. নিম্নবর্গের ইতিহাস, ঐ, পৃষ্ঠা—১৮।

১৯. নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন, ঐ, পৃষ্ঠা—২৮-২৯।

২০. 'শুভশ্রী', নিম্নবর্গের মানুষ বাংলা কথাসাহিত্যে, ৪৫ বর্ষ, ১৪১৩ : ২০০৬-০৭, পৃষ্ঠা—২০০-২০১।